আমার বাবার স্যুটকেস

অরহান পামুক : (অনুবাদ : যশোধরা রায়চৌধুরী)

তাঁর মৃত্যুর বছর দুই আগে, আমার বাবা নিজের ডায়েরি ও লেখার পাণ্ডুলিপিসমতে একটা ছোট স্যুটকেস আমাকে দিয়েছিলেন। 'আমি চলে গেলে এগুলো পোড়ো' —তাঁর নিজস্ব রসিকতার ভঙ্গিতে তিনি আমাকে বলেন।

একটু লাজুক হেসে তিনি বলেন, দেখো তো, ওর মধ্যে থেকে কোনোকিছু তোমার কাজে লাগে কি না। হয়তো আমি চলে যাবার পরে এগুলো থেকে একটা সংকলন করে ছাপাতে দিতেও পারবে।

আমরা ছিলাম আমার পড়বার ঘরে। আমাদের চারিদিক তখন বই। যেন এক কষ্টকর বোঝা, এমনই ভাব করে আমার বাবা ওই স্যুটকেসটাকে নামিয়ে রাখবার জায়গা খুঁজছিলেন। শেষে বিরক্তিকরভাবে ঘরের একটি কোনায় নীরবে সেটিকে রেখে দিলেন বাবা। আমি আর বাবা—দুজনের কেউই এই মুহূর্তটা ভুলিনি— কোথায় যেন একটা কুণ্ঠা আর লজ্জা জড়িয়ে ছিল এই মুহূর্তটিতে। তবে তারপর আমরা যে যার ভূমিকায় আবার ফিরে যাই, ফিরে যাই স্বাভাবিক জীবনে, যার যার লঘুভাবে জীবনকে দেখার, রসিকতা আর ব্যঙ্গময় ব্যক্তিত্বগুলি ধারণ করি আবার। আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। রোজকার জীবনের তুচ্ছ বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলি, তুরস্কের অশেষ রাজনৈতিক দুর্যোগ নিয়ে, বাবার ব্যর্থ ব্যবসায়িক প্রকল্পগুলোকে নিয়ে— কোনোকিছুতেই বিশেষ দুঃখ পাই না।

আমার বাবা গত হবার পর, আমার মনে আছে, বেশ কিছুদিন আমি কাটিয়েছিলাম স্যুটকেসটিকে একবারের জন্যও না ছুঁয়ে। ওর আশপাশ দিয়ে হেঁটে গেছি। এই ছোটো কালো চামড়ার স্যুটকেসটিকে, তার তালাটি, ঈষৎ গোলালো কোনাগুলিকে আমি ইতিমধ্যেই চিনতাম। আমার বাবা ছোটোখাটো এক একটি ভ্রমণকালে এই স্যুটকেলটা নিয়ে যেতেন সঙ্গে, অথবা কাজের জায়গায় যাবার সময়ে কাগজপত্র নিয়ে যেতেন। বাবা যখন বাইরে কোথাও ঘুরে আসতেন, আমি শিশু তখন, এই ছোটো স্যুটকেসটি খুলে ঘাঁটাঘাঁটি করতাম তাঁর জিনিসপত্রগুলি—কোলোন ও ভিন্‌দেশের গন্ধের মিশ্রণটাকে চেখে চেখে উপভোগ করতাম। এই স্যুটকেস আমার অতিপরিচিত বন্ধু, আমার শৈশবের শক্তিশালী এক স্মারক— আমার অতীত। কিন্তু এখন, আমি কিছুতেই একে ছুঁতেও পারছি না। কেন? নিঃসন্দেহে এর ভেতরের দ্রব্যগুলির রহস্যময়তার ভারের জন্য।

এই ভারের অর্থ কী, তাই বলি এবার। আসলে একটা ঘরের মধ্যে নিজেকে বন্দি করে, একটা টেবিলের সামনে বসে, একটা কোনয় নিজেকে আবদ্ধ করে একটি মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করে— এই ভারের অর্থভেদ করলে তাই দাঁড়াবে। অর্থাৎ, সাহিত্যেই অর্থভেদ করব এখন।

যখন আমার বাবার স্যুটকেসটা শেষ পর্যন্ত স্পর্শ করলাম, তখনো এটা খুলে উঠতে পারছি না আমি। আমি তো জানতাম, নোটবইগুলোর মধ্যে কী আছে। বাবকে আমি এর কয়েকটাতে কিছু কিছু জিনিস লিখতে দেখেছি। স্যুটকেলের ভেতরের এই বিপুল বোঝার হদিশ এই প্রথম আমার পাওয়া নয়। আমার বাবার বইপত্রের সংগ্রহ ছিল বিশাল। ১৯৪০ দশকের শেষদিকে, ইস্তানবুলে কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেতে চেষ্টা করেছিলেন তিনি— ভালেরি অনুবাদ করেছিলেন তুর্কি ভাষায়। কিন্তু আমার বাবার পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন ছিল গরিব দেশের সামান্য কিছু পাঠকসম্বলিত একজন কবির জীবন। আমার বাবার বাবা—আমার ঠাকুর্দা—একজন সফল ধনী ব্যবসায়ী—আমার বাবা শৈশবে ও যৌবনে যথেষ্ট সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করেছেন। তাই সাহিত্যের জন্য অবহেলা ও অর্থাভাব ভোগ করবার ইচ্ছে তাঁর ছিল না। লেখার জন্য অতটা আত্মত্যাগ করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। জীবনের সবরকমের সৌন্দর্যকেই তিনি ভোগ করতে চাইতেন— এটুকু আমি বুঝতাম।

স্যুটকেসটা খোলার ব্যাপারে আমার যে বাধা বা জড়তা, তা বোধহয় এই-ই, আমার ভয় হচ্ছিল যে তাঁর লেখাগুলো পড়ে আমার ভালো লাগবে না। আমার বাবাও আমার এই ভয়টা জানতেন, তাই প্রতিষেধক হিসেবে, তিনিও এমন একটি ভাব অবলম্বন করেছিলেন, যেন এই বাক্সের জিনিসগুলেকে তিনি অতটা গুরুত্ব দেন না। আমি নিজে পঁচিশ বছর লেখকজীবন যাপন করেছি— বাবার এই লঘুতা আমাকে কষ্ট দিত। তবে, বাবা যে তাঁর লেখকসত্তাকে ততটা গুরুত্ব দেননি, সেজন্য তাঁর ওপরে রাগ করবারও কোনো বাসনা আমার ছিল না। আমার আসল ভয়—যে ভয়টাকে আমি জানতেও চাইনি, আবিষ্কারও করতে চাইনি— তা ছিল এই সম্ভাবনা যে আমার বাবা হয়তো একজন ভালো লেখক! আমি বাবার স্যুটকেস খুলতে পারছিলাম না ঠিক এই ভয়টা থেকেই। আরও খারাপ যেটা— সেটা হল এই ভয়টা আমি খোলাখুলিভাবে স্বীকারও করতে পারিনি। যদি এই স্যুটকেস থেকে সত্যিকার মহৎ সাহিত্য আবিষ্কৃত হয়? তাহলে তো আমাকে স্বীকার করতেই হবে আমি যে বাবাকে চিনতাম তিনি একজন সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ? এই সম্ভাবনাটি ভয়াবহ। কারণ এত বয়সেও আমি আমার বাবাকে দেখতে চেয়েছি একজন লেখক হিসেবে নয়— নিছকই বাবা হিসেবে। লেখক তো সেই মানুষ যিনি বছরের পর বছর কাটিয়ে দেন নিজের ভেতরকার ওই দ্বিতীয় সত্তাটিকে আবিষ্কার করার ধৈর্যশীল প্রয়াসে। পুনরাবিষ্কার করতে চান তাঁর পৃথিবীটিকে— যা তাঁকে তৈরি করেছে। লেখার কথা যখন আমি বলি, তখন আসলে কোনো উপন্যাস বা কোনো গল্প, বা কবিতা, বা অন্য কোনো সাহিত্যকর্মের কথাই আমার মনে আসে না। আমার মনে আসে একজন মানুষের

কথা। যে মানুষটি নিজের ঘরের ভেতরে স্বেচ্ছাবন্দি। টেবিলে বসে, একাকী, যিনি নিজের দিকে ফিরে—তারই সঘন ছায়ায়, শব্দ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এক নতুন পৃথিবী। এই পুরুষটি—অথবা নারীটি— হয়তো একটা টাইপরাইটার নিয়ে বসেছেন— হয়তো বা কমপউটারের সহায়তাই নিলেন— কিংবা কাগজে কলমে লিখছেন— যেমন আমি করে চলেছি গত তিরিশ বছর ধরে। লিখতে হয়তো তিনি চা বা কফির কাপে চুমুক দেন— হয়তো বা সিগারেট টানেন। সময়ে সময়ে টেবিল থেকে উঠে আসেন, জানালা দিয়ে চেয়ে দেখেন, রাস্তায় বাচ্চারা খেলছে— হয়তো দেখেন গাছপালা, একটি সুন্দর দৃশ্য। হয়তো বা দেখেন ন্যাড়া একটা পেছনের দেওয়ালই! কবিতা লিখতে পারেন তিনি, বা নাটক নভেল। যেমন আমি উপন্যাস লিখি। এসব তো পরের কথা— তার আগে তো তাঁকে সেই গুরুতর কাজটি করতে হবে— টেবিলে চুপ করে বসতে হবে— নিজের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে নিতে হবে, ধৈর্য নিয়ে নিজের ভেতরের দিকে। লেখা মানে, নিজের দিকে ফেরানো ওই দৃষ্টিটাকে শব্দে রূপ দেওয়া। নিজেকে স্থির শান্ত করে বসিয়ে রাখার পর পৃথিবীটা যেরকম দেখায়— নিজের ভেতরের জগৎটা যা হয়ে ওঠে— সেটাকেই লক্ষ করা— ধৈর্য, আনন্দে, নিরবচ্ছিন্নভাবে লক্ষ করা। আমি যখন আমার টেবিলে বসি— দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ফাঁকা পৃষ্ঠায় যোগ করে চলি একটির পর একটি অক্ষর— তখন মনে হয়, যেন আমি একটা নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করছি— যেন আমার ভেতরের মানুষটাকেই টেনে আনছি বাইরে। যেভাবে একটা সেতু তৈরি হয়, একটা গম্বুজ যেভাবে নির্মাণ করা হয় —পাথরের পর পাথর যোগ করে। লেখকের পাথর তো ওই শব্দ। আমরা তার হাতের মধ্যে ধরি, তাদের একটার সাথে অন্যটার যোগাযোগ, সম্পর্ক বোধ করতে থাকি— কখনো ঈষৎ দূরে গিয়ে তাদের দেখি— কখনো একেবারে আঙুলে ও কলমের ডগায় তাদের আদর করতে করতে। শব্দগুলিকে আমরা ওজন করি, ঘোরাই, ওদিকে ওদিকে সরাই। বছরের পর বছর ধরে ধৈর্য ধরে আশায় বুক বেঁধে আমরা আমাদের নতুন জগৎটিকে সৃষ্টি করি।

লেখকের রহস্য কী? না, অনুপ্রেরণা নয়। কারণ কোনোদিন কেউ বলতে পারে না ও বস্তুটি কোথা থেকে আসে। আমার মতে তাঁর সাফল্য তাঁর একগুঁয়েমি, তাঁর ধৈর্য। তুর্কি প্রবাদ আছে একটি সূচ দিয়ে কুয়ো খোঁড়া। এই অপূর্ব কথাটি বোধহয় কবিদের কথা মাথায় রেখেই রচিত হয়েছি! প্রাচীন গাথায় আছে ফেরহাতের কথা— প্রেমের জন্য সে পাহাড় পর্বত খুঁড়ে ফেলেছিল। আমি তার ধৈর্যটিকে সম্মান করি— বুঝতেও পারি। আমার My Name Is Red উপন্যাসে যখন লিখেছিলাম সেইসব পুরাকালীন পার্শি মিনিয়েচার আঁকিয়েদের কথা— যাঁরা একটিই ঘোড়াকে বছরের পর বছর একইভাবে এঁকে চলেছেন— প্রতিটি তুলির আঁচড় যাঁদের মুখস্ত, এতটাই যে চোখ বুঁজেও তাঁরা অপূর্ব ঘোড়াটিকে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারবেন— আমি জানতাম যে আমি আসলে লিখছি লেখকের পেশার কথাই— লিখছি নিজেরই জীবন। লেখকের যদি নিজেরই গল্পটা বলতে হয়— সেটাই বলুন ধীরে ধীরে — যেন সেটা অন্য কোনো মানুষের জীবনের গল্প। নিজের সেই কাহিনিটিই তো তাঁর ভেতরে ধীরে ধীরে উঠে আসে— অবশ্য যদি তিনি টেবিলে চুপ করে বসেন, এই শিল্পের জন্য সমস্ত অপেক্ষা নিয়ে নিজেকে নিবেদন করেন তার কাছে। এই কারুকর্মটির জন্য তাঁকে অদৃশ্য উৎস থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যেন! উদ্দীপনার দেবদূত, যিনি কারও কারওকে বার বার দর্শন দিলেও অনেকের প্রতি কৃপণ—তিনি আশাবাদী ও আত্মপ্রত্যয়ীদের প্রতি পক্ষপাত দেখাবেন। কিন্তু লেখক যখন সবচেয়ে বেশি একাকী— যখন তিনি তাঁর পরিশ্রম, তার স্বপ্ন, এবং তাঁর লেখনের মূল্য সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি প্রত্যয়হীন ও সন্দিগ্ধ—যখন লেখক ভাবেন যে তাঁর এই লেখাটি কেবল তাঁর নিজেরই কাহিনি—তখনই ওই দেবদূত তাঁকে নানা গল্প, ছবি আর স্বপ্নের ভুবনের দরজা খুলে দেন : যে সব উপাদান দিয়ে লেখক রচনা করবেন তাঁর লেখার জগৎটিকে। যখনই আমি নিজের এত বছরের সম্পূর্ণ নিবেদিত সময়ের লেখালেখি, বইগুলি নিয়ে ভাবি, তখনই বিস্মিত হই একথা ভেবে, যে এর মধ্যে অনেক মুহূর্ত এমন এসেছে যখন আমারই লিখিত পৃষ্ঠায় আমি এমন সব বাক্য, স্বপ্ন ও ছবি লেখা হয়ে যেতে দেখেছি, দেখে আশ্চর্যভাবে পুলকিত হয়েছি, যেগুলি আমার নিজের কল্পনাতেও ছিল না— যেন অপর একটি শক্তি তাদের সনাক্ত করেছে ও উদারভাবে আমাকে উপহার দিয়েছে সেসব বাক্য।

বাবার স্যুটকেলটি খুলে তাঁর নোটবইগুলি পড়তে আমার এত ভয় ছিল কেন? কারণ আমি জানতাম তিনি আমার মতো বেদনা ও অসুবিধা সহ্য করবার মানুষ ছিল না। একাকিত্ব ভালোবাসতেন না তিনি। তিনি বন্ধু-বান্ধব, ভিড়, হাসিঠাট্টা, হই হই ভালোবাসতেন। কিন্তু পরে আমার চিন্তা একটু ভিন্নদিকে ঘুরে গেল। আমার নিজের লেখক জীবন ও তার অভিজ্ঞতা থেকে আমি হয়তো এই একপেশে ধারণা তৈরি করেছি, যে সবকিছু ত্যাগ করে ধৈর্য ধরে ঘরের কোণে বসতে হবে। অনেক বড়ো মাপের লেখকই তো আছেন যাঁরা বন্ধু ও পরিবারবর্গের ভিড়, মানুষের সঙ্গসুখ ও আনন্দময় আড্ডার ভেতরেই বসে লিখতে পারেন। তাছাড়া আমার বাবাও তো আমাদের শৈশবে পারিবারিক জীবনে ক্লান্ত হয়ে উঠে একবার আমাদের ছেড়ে প্যারিসে চলে গিয়েছিলেন এবং হোটেলের ফাঁকা ঘরে বসে নোটবুকের পৃষ্ঠা ভরাতেন। আমি জানতাম যে ওই বাক্সে সে-পর্বের নোটবুকও আছে। কারণ বাক্সটি যেবার তিনি আমাকে দেন সেবারই, জীবনের ওই পর্বটির কথা বার বার বলছিলেন তিনি। আমার ছোটোবেলায় যখন ওই পর্বের কথা বলতেন তিনি তখন অবশ্য নিজের লেখালেখি বা অন্য কোনো দুর্বল মুহূর্তের কথাই বলেননি তিনি। বলেছেন সার্ত্রকে প্যারিসের ফুটপাতে হাঁটতে দেখার কথা— কী কী বই পড়েছেন, ছায়াছবি

দেখেছেন, তার কথা। বলেছেন, যেন অত্যন্ত দরকারি তথ্য আদানপ্রদান করেছেন, এমনই ভঙ্গিতে। আমার লেখক হয়ে ওঠার পেছনে তো এই সত্যও আছে, যে আমার বাবা আমাকে পৃথিবীর লেখকদের কথা এত এত বলতেন— ধর্মগুরু বা পাশাদের কথা না বলে। এটা আমি কখনো ভুলি না। তাঁরই বিশাল-বইয়ের সংগ্রহের কাছেও তো আমি কতটা ঋণী! এসব কথা মনে রেখেই কি তাঁর নোটবুক পড়া আমার উচিত নয়? আমাদের সাথে থাকাকালীনও, বাবা তো আমারই মতো আপনমনে বই পড়তে ভালোবাসতেন, এসব কথাই মনে রাখতে হবে আমাকে, তাঁর বইটি পড়বার সময়ে। কতটা সাহিত্যগুণসম্পন্ন তাঁর লেখা— সেটা ভাববার কোনো প্রয়োজন নেই।

কিন্তু যখন হাসাহাসি, আড্ডায় ব্যাপৃত থাকতেন বাবা—তখনকার চেয়ে কতই না আলাদা ছিল তাঁর ওই একা ডিভানে শুয়ে হাতের বই বা ম্যাগাজিনটি ফেলে দিয়ে কোনো এক স্বপ্ন বা চিন্তার স্রোতে হারিয়ে যাওয়াটুকু। তাঁর মুখে রেখাগুলি তখন পালটে যেত। বাবার স্যুটকেসের দিকে দ্বিধান্বিত চিন্তাকুলভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এইসব ভাবি আমি। তাঁর ভেতরে তখন যে অতৃপ্তি, অপূর্ণতার চিত্র দেখেছি— তা বুঝি। এই অতৃপ্তিই তো একজন মানুষকে লেখক বানিয়ে তোলে। এত বছর পর আমি জানি। লেখক হতে গেলে ধৈর্য ও পরিশ্রমই শেষ কথা নয়— ভিড় ও সঙ্গ এড়িয়ে কখনো কখনো একা হওয়ার তাড়নাটাই বড়ো রোজকার জীবন থেকে পালিয়ে যাবার ইচ্ছটাই বড়ো— নিজেকে একটি ঘরে বন্দি করার তীব্র আকুতিটা। লেখার ভিতরে একটি গভীর পৃথিবী রচনা করতে গেলে আগে ওই আকুতিটি হওয়া প্রয়োজন। নিজের বিবেকের কণ্ঠস্বরই শুধু এই স্বাধীন লেখককে চালিত করে। বই পড়েন তিনি— অন্যদের লিখিত শব্দের সাথে মনে মনে এক বাদানুবাদে লিপ্ত হন। আধুনিক সাহিত্যের একেবারে শুরুর দিকে এই কাজ করেছিলেন মঁতেইন। আমার বাবার পছন্দের লেখক মঁতেইন। আমি সেইসব দেশি ও বিদেশি, পুব ও পশ্চিমের লেখকদের সাথেই যুক্তবোধ করি, তাঁদেরই ঐতিহ্য বহন করি— যাঁরা নিজেকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন, এবং নিজের ঘরে নিজের বইয়েদের সাথে এক বন্দিদশায় স্বেচ্ছায় ধরা দেন। এইই সাহিত্যের প্রথম প্রস্থান বিন্দু।

একবার নিজেকে স্বেচ্ছানির্বাসনদানের পর আমরা দ্রুত আবিষ্কার করি, আমরা একা নই। আমি তখন সঙ্গী হিসেবে পাই পূর্বজদের রচনাবলি—তাদের নির্মিত শব্দরাজি। এই অপরদের বই, কাহিনি, শব্দ—একেই আমরা বলি ঐতিহ্য। নিজেকে বোঝবার তপস্যায় মানবসভ্যতা সাহিত্য নামক এক অতি সমৃদ্ধ কোষাগার সৃষ্টি করেছে। যেকোনো জাতি বা সমাজ আরও ধীমান ও সমৃদ্ধ, আরও সুসভ্য হয়ে উঠতে পারে তাদের সাহিত্যকারদের রচনার বিক্ষোভময় শব্দুগলিকে অনুধাবন করেই। সভ্যতায় যখনই অন্ধকার ও পশ্চাৎপদতার যুগ এসেছে, লক্ষ করে দেখুন, তখনই বই পোড়ানোর পালা এসেছে। কিন্তু সাহিত্য তো শুধু এক জাতীয় সম্পদ নয়। সাহিত্যর নিয়ন্ত্রণ দেশ-কালাতিগ। নিজের কাহিনিটিই সাহিত্যিক এমনভাবে বলতে পারেন, যেন তা অন্য মানুষের কাহিনি, আর অন্য মানুষের কাহিনি যখন বলেন, মনে হয় তাঁর নিজের কাহিনি বলছেন। এটাই সাহিত্য। এরই জন্য সাহিত্য। কিন্তু এর জন্য প্রস্তুত হতে গেলে আগে অন্যদের বই, অন্যদের কাহিনির ভেতরে ভ্রমণ করতে হবে।

আমার বাবার গ্রন্থসংগ্রহটি ছিল বিশাল। পনেরোশো বই ছিল তাঁর। একজন লেখকের পক্ষে এটা যথেষ্ট। বাইশ বছর বয়সের ভেতরেই, প্রতিটি বই পড়ে না ফেললেও—আমি প্রতিটি বইকে চিনে ফেলেছিলাম ঠিকই। আমি জানতাম, কোন কোন বই গুরুত্বপূর্ণ, কোন কোন বই হালকা, সহজে পড়া যায়। জানতাম কোনগুলি ক্লাসিক, কোনগুলি শিক্ষার অনিবার্য অঙ্গ। কিছু বই ছিল স্থানীয় লৌকিক ইতিহাসের, এমনিতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। জানতাম কোন ফরাসি সাহিত্যের বইগুলি আমার বাবার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। বাবার বই দেখতে দেখতে, একটু দূরে গিয়ে, ভাবতাম বড়ো হয়ে আমারও গ্রন্থসংগ্রহ হবে— এর চেয়েও ভালো সংগ্রহ— আর নিজের চতুর্দিকে নিজের পৃথিবীটি রচনা করে তুলব এইভাবেই। বিশ্বের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র বলে মনে হত আমার, বাবার গ্রন্থাগারকে। যদিও ইস্তানবুলের বুকে এই গ্রন্থাগার আসলে পৃথিবীর এক আপেক্ষিক চিত্র। ইস্তানবুলের একটি কোণ থেকে দেখা এক চিত্র তা। ১৯৪০ ও ১৯৫০ দশকে বাবা ইস্তানবুলের নতুন ও পুরোনো দোকান থেকে কেনা বই সেগুলি— বাবার প্যারিস ও আমেরিকা ভ্রমণের সময়ে সময়ে কেনা কিছু বইও তার সাথে ছিল। আমিও চিনতাম পাশ্চাত্যের বই দিয়ে। ১৯৭০ দশকে আমিও উচ্চাকাঙ্ক্ষীর মতো আমার লাইব্রেরিটি বানাতে শুরু করি। যেমন আমি লিখেছি আমার ইস্তানবুল গ্রন্থে, তখনও লেখক হব বলে ভাবিনি আমি—ভেবেছিলাম অন্তত আঁকিয়ে হব না— কিন্তু কী যে হব তা জানতাম না। ভেতরে এক বিশ্রামহীন কৌতূহল— এক আশা পড়ার, শেখার— কিন্তু একইসাথে ভীষণ এক অপূর্ণতাবোধ—আমার জীবন যেন অন্যদের মতো হবে না। এই বোধটা বাবার গ্রন্থাগারের দিকে চেয়ে থাকার বোধের সাথে কিছুটা যুক্ত। কারণ ইস্তানবুলে তখন বসবাস মানে পৃথিবীর সবকিছুর থেকে দূরে এক কোণে বসবাসের মতো মফস্সলের জীবন। আরও একটা কারণে উৎকণ্ঠ—যে দেশে আমি থাকি তারা শিল্পের প্রতি সদয় নয়। কোনো আশা নেই আঁকিয়ে বা লেখক হতে চাইলে এখানে। ১৯৭০-এর দশকে বাবার দেওয়া টাকায় লোভীর মতো পুরোনো বইয়ের দোকানের দুর্দশা দেখে আলোড়িত হতাম— কী দুঃখজনক এলোমেলো এই দরিদ্র হাভাতে বই-ব্যবসায়ীরা—মসজিদের উঠোন বা ভেঙে পড়া দেওয়ালের উপরে, গানের পাশে বই সাজিয়ে।

আমি এই পৃথিবীর 'কেন্দ্রে' নই। যেখানে জীবন অনেক বেশি সমৃদ্ধ—সেই কেন্দ্র ইস্তানবুল ও তুর্কিদেশে বিচ্ছিন্ন— বহিরাগত। হয়তো এখন আমি জানি যে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের মানুষেরই এই বোধ। অন্যদিকে,

বিশ্বসাহিত্যের এক কেন্দ্র আছে—আমি তা থেকেও বিচ্যুত। আসলে 'বিশ্ব' বলতে যা আমি বুঝছিলাম তা আসলে 'পাশ্চাত্য'। আমরা তুর্কিরা সেই পাশ্চাত্যসাহিত্যে বহিরাগত। একদিকে রয়েছে ইস্তানবুলের বই, ইস্তানবুলের সাহিত্য, আমাদের সংস্কৃতি, পৃথিবী, তার অজস্র প্রিয় খুঁটিনাটিসহ— অন্যদিকে এই 'অন্য' ও পাশ্চাত্যের সাহিত্য, পৃথিবীর বই। তার সাথে আমাদের পৃথিবীর কোনো মিল নেই। একইসাথে এই অমিল থেকে আমাদের বেদনা জাগে, জাগে আশাও। পড়া ও লেখার লেখার ভেতর দিয়ে আমরা এই অন্য পৃথিবীর 'অন্যত্ব' আস্বাদন করি— বিস্ময়কর এই পৃথিবীতে আশ্রয় নিই। আমরা এই অন্য পৃথিবীর 'অন্যত্ব' আস্বাদন করি— বিস্ময়কর এই পৃথিবীতে আশ্রয় নিই। আমাদের বাবা উপন্যাস পড়তেন তুর্কির জীবন থেকে পলায়ন করতে—পাশ্চাত্যের দিকে পালাতে। আমিও পরবর্তী সময়ে এটাই করব। নিজের সংস্কৃতি থেকে পলায়ন করতে, মুক্তি পেতেই আমরা তখন তুলে নিতাম পাশ্চাত্যের বই। শুধু পড়ে নয়, লিখেও তখন ইস্তানবুল ছেড়ে পাশ্চাত্যে পালাচ্ছি। বাবা যেমন, প্যারিস গিয়েছিলেন ওই নোটবুকগুলো ভরিয়ে তুলতে—নিজেকে একটা হোটেলের ঘরে বন্ধ করে। লেখা হয়ে গেলে তুর্কিতে ফিরে আসেন। বাবার স্যুটকেসের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, এটাই বোধহয় আমার অশান্তির কারণ। তুর্কিতে পঁচিশ বছর ধরে একটা ঘরে বসে বসে লেখার পর, আমার বোধহয় লজ্জা হয়, আমার বাবার এই গোপনে গোপনে, সমাজ-রাষ্ট্র-জনগণের চোখ এড়িয়ে লেখা নিজের মনের গভীর কথাগুলি স্যুটকেসে বন্দি করে রাখার। হয়তো আমার বাবা যে লেখাকে আমার মতো পেশা করে নেননি, দেখেননি ততটা গুরুত্ব দিয়ে আমার তা নিয়েও ক্ষোভ ছিল।

আসলে বাবার প্রতি আমার রাগ ছিল। কেননা তিনি আমার মতো করে তাঁর জীবন কাটাননি। কেননা নিজের জীবনের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার ইচ্ছাও তাঁর ছিল না। আনন্দে, বন্ধু ও প্রিয়জন সংসর্গে জীবন কাটিয়েছেন তিনি। তবে আমার একটা অংশ এটাও জানত, যে আমি ততটা 'ক্রুদ্ধ' ছিলাম না, যতটা 'ঈর্ষান্বিত'। এই দ্বিতীয় শব্দটাই সঠিক। আর সেজন্যেই অস্বস্তি। 'সুখ কী?' এই প্রশ্ন আমি নিজেকে বার বার করছিলাম রাগত, ক্ষুব্ধ স্বরে। তবে কি একাকী একটি ঘরে গভীর জীবন যাপন করেছি আমি, এই ভেবেই সুখী হওয়া যায়? তবে কি, সমাজে একটি আরামপ্রদ জীবন যাপন করে চলতে পারাই সুখী হওয়া—সবাই যা বিশ্বাস করে, তাইই বিশ্বাস করা? গোপনে লেখালেখি করে চলা, বাইরে বাইরে সবার সাথে মিলেমিশে থাকা, সেটাই কি সুখী জীবন? কিন্তু এই খিটখিটে প্রশ্ন করার সত্তাটিকে আমি বলি— একটা ভালো জীবনকে কি 'সুখী' জীবন হতেই হবে। সবাই তবে কেন বলে, জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস 'সুখে' থাকাটাই। এর একেবারে উলটোটাও সত্যি হতে পারে হয়তো! কে বলে দেবে? বাবা যে নিজের পরিবার ছেড়ে বহুবার দূরে গেছেন—আমি তার সেই অংশটা জেনেছি? তাহলে তাঁর অশান্তি—অসুখ বুঝি, এই দাবি করছি কী করে?

এইসব চিন্তাই আমাকে চালিত করছিল, বাবার স্যুটকেসটি খোলবার সময়ে। বাবার সেই গুপ্তকথা— সেই অজানা অশান্তির খোঁজ পাব আজ হয়তো— যা কাউকে না বলে তিনি শুধু লেখার ভেতরেই ঢেলে দিয়েছিলেন। স্যুটকেসটা খোলামাত্র তার ভেতরের গন্ধে ভ্রমণের সুবাস টের পাই আমি। চিনতে পারি কয়েকটা খাতাকে। পড়তে শুরু করে আমি খুঁজতে থাকি আমার বয়সে বাবা কী ভাবতেন সেই কথা— তাই পাই না। পাই এক 'লেখক' সুলভ বাচনভঙ্গি —যার সাথে আমার বাবার ব্যক্তিত্বের কোনো মিল পাই না। যেন এক কৃত্রিম কণ্ঠে কথা বলেছেন বাবা। অনেকগুলো ভয় কাজ করে আমার মধ্যে— ইনি কি তাহলে আমার বাবা নন? আমি কি তাহলে বাবার লেখায় কোনো ভালো জিনিসই খুঁজে পাব না? তবে কি বাবা অন্য লেখকদের দ্বারা অতিরিক্ত আচ্ছন্ন, প্রভাবিত? সব প্রশ্ন মিলে আমাকে বিষণ্ণতার অতলে ঠেলে দেয়। নানান সংশয় আমাকে বিক্ষত করে— আমার লেখার জীবনের একেবারে শুরুর দিকে যেমন হয়েছিল। ভয় হয়েছিল, কোনোদিন হয়তো আমাকে লেখা ছেড়ে দিতে হবে, যেমন ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছিলাম। বাবার স্যুটকেসটা বন্ধ করে তুলে রাখতে রাখতে আমার মনে দুটো মূল ভাব কাজ করে— এক, আমি সৎ নই। দুই, আমি এক ছোট্ট মফস্সলের কোণো বন্দিশশা যাপন করছি। বহুদিনের এই দুটি ভাবনা আমার আবার জাগল আজ। অগেও অসংখ্য বছর ধরে আমি এদের রূপ-রঙে, এদের আচমকা কেটে পড়ায়, আমার নার্ভের উপরে উৎপাত করায় অভ্যস্ত ছিলাম। শুধু বই লিখতে লিখতেই আমি সততার সমস্যা সম্বন্ধে গভীরতর অনুধাবনে পৌঁছিয়েছি (My Name Is Red ও The Black Book)। পৌঁছিয়েছি প্রান্তিক অস্তিত্বের সমস্যাবিষয়ক প্রশ্নেও। আমার কাছে লেখক হয়ে ওঠা মানে নিজের ভেতরকার গোপন ক্ষতগুলিকেও জেনে উঠতে পারা। যেগুলি সম্বন্ধে আমরা নিজেরাই অবগত নই। ধৈর্য ধরে সেগুলিকে খুঁড়ে দেখা, বুঝে দেখা, জানতে পারা– আলোকপাত করা– তারপর সেগুলিকে নিজের সচেতনতার বৃত্তে নিয়ে এসে তাদের স্বীকার করা।

লেখক সেইসব কথাই লেখেন যা সকলেই জানে, কিন্তু জানে বলে কেউ জানে না। এই নির্জ্ঞানের জ্ঞানকে ক্রমশ উন্মুক্ত হতে দেখা এক আনন্দময় ঘটনা। পাঠক একইসাথে এক পরিচিত অথচ অলৌকিক জগতে প্রবেশ করে। লেখক নিজেকে গৃহবন্দি করে নিঁখুত শিল্পে এই পৃথিবীটাকে রচনা করেন। নিজের গোপন ক্ষতগুলি দিয়ে তিনি যদি শুরু করেন, নিজেরই অজান্তে তিনি মানবিকতার উপরেই গভীর আস্থার প্রমাণ দিচ্ছেন। আত্মপ্রত্যয় তোমার আমার আসে সেই স্থান থেকেই —আমি জানি মানুষ প্রত্যেকে প্রত্যেকের মতো। সবারই আছে আমারই মতো ক্ষত—যা তারা গোপনে বয়ে বেড়ায়। আমি জানি সকলেই আমার কথা বুঝবেন। এই শিশুসুলভ আশাবাদ

থেকেই সকল সৎসাহিত্যের শুরু—প্রতিটি মানুষই একে অন্যের মতো। লেখক এই একটিই মানবতার কথা বলেন—এ এক পৃথিবী, যার কেনো কেন্দ্র নেই।

কিন্তু বাবার স্যুটকেস ও আমাদের ইস্তানবুলের বিবর্ণ জীবন থেকে যেন মনে হয়— পৃথিবীর একটা কেন্দ্র আছে— আর তা আমাদের থেকে অনেক অনেক দূরে। চেখভীয়, মফস্সলীয় এক বোধ জন্ম নেয় এ থেকে। আমার বইতে আমি একথা লিখেছি— এবং নিজের সততা নিয়ে প্রশ্নের শুরুও এখান থেকেই। নিজের অসম্পূর্ণতাবোধ—যা আমাদের তুর্কিদের ছিল—এই পৃথিবীর অনেকের ভেতরেই সেই একই অনুভূতি আছে। নিরাপত্তাহীনতা ও পতনোন্মুখতার জন্মও হয় এখান থেকেই। ভূমিহীনতা, খাদ্যহীনতা, গৃহহীনতায় মানবজাতি ভুগছে— কিন্তু টেলিভিশন ও খবরের কাগজ এসব মৌলিক সমস্যার কথা সাহিত্যের চেয়ে অনেক সহজেই সরাসরি বলে ফেলে। সাহিত্যের এখন কাজ মানুষের মূল ভয়গুলিকে বর্ণনা করা—বহিষ্কারের ভয়, 'না' হয়ে যাবার ভয়— মূল্যহীন হয়ে পড়ায় ভয়। যৌথজীবনেও কত অপমান, নিরাপত্তাহীনতা, ক্ষোভ, কল্পিত অপমান! তার সাথেই যুক্ত জাতীয়তাবাদী নানা হুংকার। এইসব ভাবের সম্মুখীন হলেই তার অন্ধকার অযৌক্তিতা আমাকে জানান দেয়— আমার মধ্যে আছে এইসব অন্ধকার। পাশ্চাত্যের থেকে দূরত্বে স্থাপিত বহিরাগত নানা জনগোষ্ঠী সংস্কৃতির এইসব বোধের সাথে অতি সহজেই নিজের বোধকে মিলিয়ে নিতে পারি আমি। হয়তো ভয় থেকেই নানা-মূর্খতায় উপনীত হয় এইসব জনগোষ্ঠী। আর পাশ্চাত্য, যার সাথে সহজেই যোগস্থাপন করতে পারি আমি— সেও নিজের ধনসম্পত্তি গর্বে, জগৎকে নবজাগরণ, বিজ্ঞানের আলো, নব্যদুনিয়ার উপহার দেওয়ার দর্পে, কখনো কখনো এক মূর্খ আত্মসন্তুষ্টিতে ভোগে। আসলে শুধু আমার বাবা নয়— প্রত্যেকেই আমরা এক কেন্দ্র-সম্পন্ন বিশ্বের ধারণাকে অকারণ মূল্য দিই। লেখকের কাজ—নিজেকে ঘরে বন্ধ করে লেখা—এই ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীতে কাজ করে যাওয়া। বিশ্বাস রাখা যে আমাদের লেখাও একদিন পঠিত ও মূল্যায়িত হবে। কারণ সারা পৃথিবীর মানুষই পরস্পরের মতো। এই আশাবাদ বার বার ব্যাহত হয়— প্রান্তিকতার ক্রোধে ক্ষতবিক্ষত হয়। দস্তয়েভস্কির পাশ্চাত্যের প্রতি প্রেম ও ঘৃণা ছিল সারা জীবনের সঙ্গী। আমিও এই অনুভূতির ভাগী।

বছরের পর বছর আশাবাদী এই লিখে চলায় আমরা যে পৃথিবী সৃষ্টি করি— সেই পৃথিবীটি ধীরে ধীরে একেবারে অন্য কোথাও গিয়ে পৌঁছোবে। আমাদের টেবিল থেকে অনেক দূরে নিয়ে যাবে— সম্পূর্ণ অন্য এক পৃথিবীতে। আমার বাবা কি এই অন্য পৃথিবীতে গিয়ে পৌঁছোতে পারতেন না? যে পৃথিবীটা ধীরে ধীরে সমুদ্রযাত্রার শেষে দিগন্তে এক সবুজ দ্বীপের মতো কুশায়ার ভেতর থেকে জেগে ওঠে। যেমনভাবে পাশ্চাত্যের অভিযাত্রীরা তুর্কিকে দেখেছিলেন, দক্ষিণ থেকে এসে, কুয়াশার ভেতর থেকে ইস্তানবুলকে জেগে উঠতে। আশা ও কৌতূহল নিয়ে শুরু করা সেই যাত্রার শেষে, মসজিদ ও মিনারের মাথা, গৃহ-রাস্তা- পাহাড়-সেতুতে সাজানো এক নতুন পৃথিবী খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁরা। যে পৃথিবীটিকে দেখলে সেখানে প্রবেশ করে হারিয়ে যেতে ইচ্ছা করে— যেমন একটি বই খুলে, আমরা হারিয়ে যাই। আমরা যখন লিখি, আবিষ্কার করি সেই নতুন পৃথিবী আমাদের প্রান্তিক, ক্রুদ্ধ, বহিরাগত অস্তিত্বের ওপারে।

তাই এখন আমি পৌঁছেছি এক বিপরীত বোধে— আমার তারুণ্যের দিনগুলির সেই বোধ, যে, আমার কাছে ইস্তানবুলই বিশ্বের কেন্দ্র। এই বোধটি এসেছিল শুধু আমি ইস্তানবুলে থাকি সেজন্য নয়— এসেছিল তেত্রিশ বছর ধরে এই শহরেরই পথ ঘাট সেতু মানুষ কুকুর বাড়িঘর মসজিদ ফোয়ারা দোকান—আশ্চর্য নায়ক বিখ্যাত চরিত্রের অন্ধকার বিন্দুগুলি, এর দিন ও রাত— সব কিছু নিয়েই লিখে চলেছি আমি। একটা বিন্দুতে পৌঁছে—এই ইস্তানবুল আমারই সৃষ্টি— এই ইস্তানবুল আমারই মাথার ভেতের আছে। এবং আমি যে ইস্তানবুলে থাকি, তার চেয়েও বেশি বাস্তব এটি। এই সময়েই আমার কাহিনির মানুষজন, বাড়ি ঘরদোর নিজেদের ভেতরে কথা কয়ে উঠল যেন—নিজেদের স্বকীয় অস্তিত্ব লাভ করল। একটা সূচ দিয়ে যদি কোনো মানুষ একটা কুয়ো খুঁড়ে তোলে—আমার অবস্থা তারই মতো।

কে জানে, আমার বাবাও এমনই সুখ পেয়েছেন কি না, তাঁর নিজের লেখালেখির সময়ে। বাবার স্যুটকেসের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়ল বাবাকে বিচার করার অধিকার নেই আমার। তিনি আমার প্রতি স্নেহময় পিতার ভূমিকা পালন করেছেন— আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাননি, শাস্তি দেননি, ক্ষমতা প্রয়োগ করেননি আমার উপরে, সর্বদা সম্মান করেছেন আমার মতো। আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। আমি বারে বারে ভেবেছি যেন আমার কল্পনাশক্তি থেকে যে উৎসমুখ তৈরি হয়েছে— শিশুসুলভতা বা স্বাধীনতা যে জন্যেই হোক— যে লাভ হয়েছে আমার, তার জন্য আমার বাবার উদারতা অনেকটাই দায়ী। আমি বাবাকে ভয় পাইনি কোনোদিন। এবং ভেতরে একটা বিশ্বাসও আমার আছে যে বাবা নিজে লেখক হতে চেয়েছিলেন বলেই আমিও লেখক হতে পেরেছি। কারণ আমি বাবার মতো হতে চেয়েছিলাম। আমারও উচিত বাবার লেখাগুলিকে ধৈর্য ধরে পড়া। বোঝার চেষ্টা করা তাঁকে।

তাই নিজের সব মনোযোগ একত্র করে তাঁর লেখাগুলি —কয়েকটি নোটবুক—পড়তে শুরু করি আমি। বাবা কী লিখেছেন? প্যারিসের বিবরণ—কবিতা—কূটভাস—বিশ্লেষণ। একথা মনে করাও যেন কোনো দুর্ঘটনাগ্রস্থ মানুষের পরবর্তী সময়ে দুর্ঘটনার অনুপুঙ্খ মনে করার চেষ্টা। সর্বদাই বড়ো বেশি অতিরিক্ত কিছু মনে পড়ে যাবার ভয়। শৈশবে বাবা-মায়ের ঝগড়া মনে পড়ে, হঠাৎ তাঁদের চুপ করে যাওয়া, রেডিয়োটা খুলে দিলেন বাবা—গানের

সুরে ডুবে গেলাম, ভুলে গেলাম। এসব মন খারাপের কথা না বলে বরং বলি, কটা মিষ্টি কথা। আমরা লেখকরা বার বার যে প্রশ্নের সম্মুখীন হই, তা হল, 'কেন তুমি লেখ?' লিখি কারণ ভেতরে লেখার আন্তরিক তাগিদ অনুভব করি। লিখি কারণ অন্য কেনো কাজ পারি না। লিখি কারণ আমি যেমন লিখি তেমন বই পড়তে চাই। লিখি কারণ তোমাদের সবার উপর আমি রেগে আছি। লিখি কারণ সারাদিন ঘরে বসে লিখতে ভালো লাগে। লিখি কারণ জীবনে চাই আমরা কীরকমভাবে বেঁচে ছিলাম —আছি—ইস্তানবুলে, তুর্কিতে, লিখিকারণ কাগজ,কলম, কালির গন্ধটা ভালো লাগে। লিখি কারণ সাহিত্যে বিশ্বাস করি, উপন্যাসের শিল্পে বিশ্বাস করি— অন্য কোনোকিছুতেই বিশ্বাসেরও অনেক আগে। লিখি কারণ তাই অভ্যাস ও পাগলামি। লিখি কারণ আমার ভয় হয় মানুষ আমাকে ভুলে যাবে। লিখি কারণ লেখা আমাকে বিভা দান করে। লিখি একা হতে। লিখি, একটা বুঝতে যে আমি তোমাদের সবার প্রতি কতটা ক্রুদ্ধ। লিখি কারণ আমি চাই আমাকে পাঠ করা হোক। লিখি কারণ একবার একটা লেখা শুরু করলেই সেটা শেষ করতে ইচ্ছে হয়— তা সে উপন্যাস-প্রবন্ধ—একটা পৃষ্ঠা—যাই হোক। লিখি কারণ সবাই আমার কাছে সেইটেই চায়। লিখি কারণ শিশুর মতো বিশ্বাস করি— লাইব্রেরিরাই একমাত্র অমর। বইয়েদের তাকের উপরে বসে থাকা অমর। লিখি কারণ জীবনের সব সৌন্দর্য ও অপরূপতাকে শব্দে অনুবাদ করতে উত্তেজনা হয়। আমি গল্প বলতে চাই না, গল্পকে নির্মাণ করতে চাই। লিখি কারণ স্বপ্নে যেমন হয়— তেমনই একটা কোথাও পালিয়ে যেতে চাই কিন্তু ঠিক পৌঁছোতে পারি না সেখানে। লিখি কারণ কোনোদিনই সুখী হতে পারিনি। লিখে সুখী হতে চেয়েছি আমি।

আমাকে স্যুটকেসটা দিয়ে যাবার এক সপ্তাহ পরে বাবা এসে আমাকে একটা চকোলেট দিলেন, যেন আমি যে আটচল্লিশ বছরের সেটা ভুলে গেছেন। আমরা জীবন, রাজনীতি, পরিবার নিয়ে গপ্পো করলাম। এক মুহূর্তের জন্য বাবার চোখ স্যুটকেলের দিকে গেল, বুঝলেন আমি ওটা নেড়েছি। দুজনে দুজনের দিকে তাকালাম। একটা নীরবতা চাপ বাঁধল ঘরে। আমি তাঁকে বলতে পারলাম না স্যুটকেসটা খুলেছি, অন্যদিকে তাকালাম। বলতে পারলাম না পড়েছি। কিন্তু তিনি বুঝে নিলেন। আমি বুঝলাম যে তিনি বুঝলেন। তিনিও বুঝলেন যে আমি বুঝলাম যে তিনি বুঝলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে গেল। বাবা আমার সাধাসিধে, সুখী বাবা হাসলেন! বাড়ি ছেড়ে যাবার সময়ে সেইসব উৎসাহব্যঞ্জক কথা আমাকে বললেন, যা বাবা হিসেবে বলে থাকেন সর্বদাই।

আবারও আমি তাঁর আনন্দময়, ভারহীন, ঝঞ্ঝাটহীন চলে যাওয়া দেখলাম। আনন্দের স্ফুরণ হল আমার মধ্যে— লজ্জিত হয়ে বুঝলাম, তাঁর মতো জীবনকে সহজে স্বীকার করতে আমি পারিনি। আমাকে বাবা কোনো কষ্ট দিলেন না, আমাকে স্বাধীনতা দিলেন— তাঁর মতো সুখী জীবন না যাপন করে লেখালেখি করার দিকে ঝুঁকতে।

ঠিক তেইশ বছর আগে, যখন, বাইশ বছর বয়সে লেখক হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি তার চার বছর কেটে গেছে, আমি আমার প্রথম উপন্যাস শেষ করেছিলম— Cevdet Bey and Sons। বাবাকে একটা টাইপ করা ম্যানাসক্রিপ্ট দিয়েছিলেন। তখনও ছাপা হয়নি লেখাটা। পড়ে তাঁর কী মনে হয়েছে বলতে অনুরোধ করেছিলাম। বাবার মতামত আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেননা, তিনি আমার লেখক হবার ব্যাপারে অনুমোদন দিয়েছিলেন, মায়ের মতো বাধা দেননি, বাবা লেখাটা নিয়ে বাইরে গেছিলেন। ফেরার দিন, বাবার প্রতিক্রিয়া জানতে অধৈর্য আমি দৌয়ে গিয়ে দরজা খুলি। বাবা কিছু না বলে শুধু আমাকে দু-হাত জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করেন। আমরা গভীর আবেগে নীরব থাকি। তারপর বাবা শান্ত হয়ে বসে অতি উচ্চ প্রশংসা শুরু করেন আমার লেখার। অতিকথন ছিল তাতে। তিনি একথাও বলেন যে আমি একদিন এই পুরস্কারটি পাব—যেটা নিতে আমাকে এখানে দাঁড়াতে হয়েছে।

এটা কোনো মত নয়, বা পুরস্কারকে লক্ষ্য হিসেবে স্থাপন করা না। এটা আদর্শ তুর্কি বাবার মতো ছেলেকে উৎসাহ দেওয়া— 'একদিন তুমি পাশা হবে!' বহু বছর ধরেই বাবা এমনটা বলে আসছেন আমাকে।

বাবা ডিসেম্বর ২০০২-এ মারা গেছেন।

আজ, আমি সুইডিশ আকাদেমির সামনে, সম্মানিত ব্যক্তিদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি— আপনারা আমাকে এই বিশাল পুরস্কার দিলেন— বিরল সম্মান। কেবলই মনে হচ্ছে আজ বাবা যদি আমাদের মধ্যে থাকতেন।